গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৬ - ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেট্রল-ডিজেলের বারবার মূল্যবৃদ্ধিকেও সিপিএম-সিপিআই সম্ভবত গুরুতর ইস্যু মনে করে না

— নীহার মুখার্জী

সি পি এম - সি পি আইয়ের সমর্থনপুষ্ট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার কেন্দ্রের সরকারি গদিতে বসার মাত্র ষোল মাসের মধ্যেই যেভাবে পঞ্চম বার পেট্রল-ডিজেলের দাম উচ্চহারে বাড়ালো, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি পর্যায়ক্রমে সমস্ত অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের দাম রেকর্ড পরিমাণ বাড়াবে যা ইতিমধ্যেই নির্মম পুঁজিবাদী শোষণে পুরোপুরি নিঃস্বে পরিণত জনগণ আর বহন করতে সক্ষম নয়। রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধির খড়্গ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যা যেকোন মুহূর্তে জনগণের উপর নেমে আসবে।

বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সমতাবিধানের যে অজুহাত সরকার দেখাচ্ছে সে সম্পর্কে কমরেড মুখার্জী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন — সরকারের এই বহু ব্যবহৃত অজুহাতটি নিতান্তই প্রতারণা, কারণ সরকার চাইলে পেট্রল ও ডিজেলের উপর চাপানো অত্যধিক কর ও সেস কিছুটা কমিয়ে জনগণকে দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধির আঘাত থেকে রেহাই দিতে পারত। কিন্তু আরও ধিক্কারের বিষয় হল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া তেল ব্যবসায়ী চক্র গোটা বিশ্বের জনগণকে শোষণ করে মুনাফা বাড়াবার জন্য খেয়াল খুশিমতো এক তরফা তেলের দাম যেভাবে বাড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে প্রতিহত করার জন্য এই তেল কোম্পানিগুলির উপর তীব্র চাপ সৃষ্টির পথে ভারত সরকার যাচ্ছে না।

মেকি মার্কসবাদী সিপিএম এবং সিপিআইয়ের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন — এইসব দলগুলি জনগণের জন্য অশ্রুপাত করতে করতেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে বারবার একতরফাভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে দিচ্ছে। তারা চাইলে কেন্দ্রের উপর যথেষ্ট পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে, এমনকী সমর্থন প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি দিয়ে পেট্রল-ডিজেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে পারত, যেটা তারা করছে না। এই ঘটনাই তাদের মেকি বিরোধিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে এবং তাদের বিরোধিতার একমাত্র উদ্দেশ্য যে জনগণকে ঠকানো তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সিপিএম ও সিপিআইয়ের এই আচরণ প্রসঙ্গে কমরেড মুখার্জী বলেন, তারা সম্ভবত জনগণের উপর এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক আক্রমণকেও তত গুরুতর ইস্যু মনে করে না, যেটার জন্য কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে বিব্রত করা যায়।

ক্রমাগত এ ধরনের মারাত্মক অর্থনৈতিক আক্রমণ নীরবে সহ্য না করে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী দেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

তেল থেকে ট্যাক্স ও মুনাফা লুটছে — *সাতের পাতায়*

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়

মহান নেতা মাও সে-তুঙ স্মরণে সমাবেশ

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ স্মরণে ৯ সেপ্টেম্বর দফায় দফায় বৃষ্টির মধ্যেই এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে সমাবেশ । বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। (বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

২৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিরোধে ধারাবাহিক আন্দোলন প্রয়োজন

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ১৬ দফা দাবিতে ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম অব মাস অর্গানাইজেশনের (এন পি এম ও) পক্ষ থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের অন্যতম শরিক ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই কে কে এম এস, এ আই এম এস এস, এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এই ধর্মঘটকে সফল করাই শুধু নয়, আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী, সুসংবদ্ধ এবং একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ, শুধু একদিনের একটি ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, যা পরিচালনার জন্য অফিসে - কলে - কারখানায় - স্কুলে-কলেজে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা আবশ্যক।

এই ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান দাবি শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা। দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন পাল্টে দিয়ে ছাঁটাইয়ের অবাধ অধিকার দিতে চলেছে মালিকদের। শ্রমিক নিধনের এই কার্যক্রমকে বলা হচ্ছে ‘সংস্কার’। তিনশো লোক কাজ করেন এমন ইউনিটে যাতে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত ছাঁটাই করতে বা সংস্থা বন্ধ করে দিতে পারে, তার জন্য শিল্প বিরোধ আইনে পরিবর্তন আনার জন্য খসড়া তৈরি হচ্ছে। এর ফলে দেশের ৬৬ শতাংশ কলকারখানাই মালিকের ইচ্ছামত ছাঁটাইয়ের আওতায় চলে যাবে। যে বিলটি মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের জন্য তৈরি হচ্ছে, তাতে বলা হয়েছে, “ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে মজুরি আইন, কারখানা আইন, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, মাতৃত্ব আইন সহ বিভিন্ন শ্রম আইন মানা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের লিখিত বক্তব্যকেই সরকার গ্রাহ্য করবে। তার ওপর কোনরকম নজরদারির ব্যবস্থা বা মামলা মোকদ্দমার সুযোগ থাকবে না। এই বিল তৈরি করেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রক” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭-৮-০৫)। আক্রমণ এখানেই শেষ নয়, “স্থায়ী চাকুরের সংখ্যা কমাতে ‘ক্যাজুয়াল’ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রের সংজ্ঞাই বদলে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। ঠিকা কর্মী আইনে এখন বলা আছে, যেসব ক্ষেত্রে কাজের চরিত্র ‘স্থায়ী এবং সবসময়ে একইরকম’ সেখানে ঠিকা কর্মী রাখা চলবে না। আইন বদলে সে জায়গায় কাজের চরিত্রকে ‘কোর’ ও ‘নন-কোর’ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং নন-কোর ক্ষেত্রকে ঠিকা কর্মীদের জন)্য খুলে দেওয়া হবে। ফলে অধিকাংশ শিল্পেই ঠিকা কর্মী নিয়োগের পথ প্রশস্ত হবে। এই

সাতের পাতায় দেখুন

সমস্ত বেকারের কাজ, বেকার ভাতা, পরিচয়পত্রের দাবিতে ও মদের লাইসেন্সের প্রতিবাদে

জেলায় জেলায় অবরোধে সামিল যুবকরা

৬ সেপ্টেম্বর। উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন সর্বত্রই আওয়াজ উঠেছিল 'যুবকদের কাজ দিতে হবে', 'বেকারভাতা দিতে হবে।' বাংলার যৌবন নতুন উদ্যমে, নতুন তেজে এ আই ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছিল সেদিন। দাবি উঠেছিল 'মদ নয় — চাকরি চাই' 'মারণ জুয়া লটারি নয়, শ্রম নিবিড় শিল্প চাই', 'শিল্পায়নের নামে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত রুখে দিন।' হাতে হাতে দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ব্যানার — তাতে লেখা 'জমির খাজনা, পঞ্চায়েতি ট্যাক্স বাড়ানো চলবে না' প্রভৃতি। এ আই ডি ওয়াই ও আহূত রাস্তা অবরোধে দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতায় হাজারে হাজারে যুবক রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রতিবাদ করেছে পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় ইউ পি এ সরকারের এবং রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে। পুলিশের জুলুম, লাঠিচার্জকে উপেক্ষা করে শত শত যুবক-যুবতী কলকাতার রাজপথে, মহাকরণের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও যুবজীবনে ও জনগণের উপর নেমে আসা অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সর্বদা লড়তে প্রস্তুত ও বদ্ধপরিকর। অশ্লীল ছবির প্রদর্শনী ও পত্র-পত্রিকার প্রসার এবং মদের ঢালাও প্রসারের মধ্য দিয়ে যুব সমাজের নৈতিক মানকে ধ্বংস করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ উচ্চারিত হয়েছে এদিন।

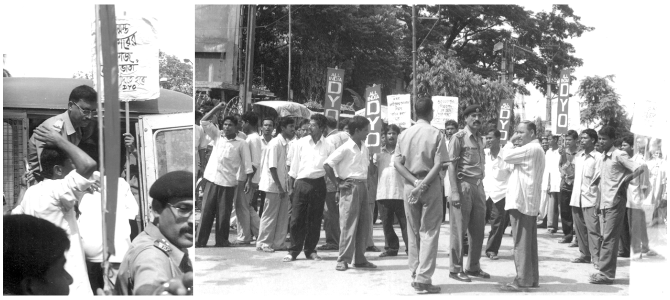

কোচবিহার শহরের কোর্ট মোড়ে অবরোধ ও গ্রেপ্তার

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির ডাকে শতাধিক যুবক-যুবতীর সুসজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টাউন স্টেশন রোড এবং দিনবাজার মোড় অবরোধ করে। জেলা সভাপতি কমরেড জীবন সরকার যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাজ্য সরকার বামপন্থী তক্‌মা লাগিয়ে গরিব খেটে-খাওয়া মানুষদের ঠকাচ্ছে। বেকার যুবকদের কাজের ব্যবস্থা না করে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে। অবরোধ থেকে দাবি ওঠে বন্ধ চা-বাগানের লিজ বাতিল করে সরকারকে অধিগ্রহণ করতে হবে। চাকরি পরীক্ষায় কোনরূপ অর্থ নেওয়া চলবে না। শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

কোচবিহার ঃ ৬০,০০০ শিক্ষকের শূন্যপদ সহ সমস্ত শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ, বেহাল রাস্তা সংস্কার, এম জে এন হাসপাতালের জমিতে মার্কেট কমপ্লেক্স করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার সহ নয় দফা দাবিতে কোচবিহার শহরের কোর্ট মোড়ে মেখলিগঞ্জের ভি আই পি মোড়ে ও দিনহাটা শহরে রাস্তা অবরোধ হয়। হলদিবাড়িতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। অবরোধ হঠাতে পুলিশ মোট ৫৫ জন যুবকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

দার্জিলিং ঃ ফুলবাড়ি এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার নামে এস জে ডি-র জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ও সমস্ত বেকারের কাজের দাবিতে এ আই ডি ওয়াই ও ফুলবাড়ির জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধকে ঘিরে স্থানীয় যুবক ও সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল অভূতপূর্ব।

রায়গঞ্জ ঃ রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শহরের বিদ্রোহী মোড় ঘুরে বাসস্ট্যান্ডের সামনে আসে এবং সেখানে প্রতীকী মদের বোতল পোড়ানো হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড বিপ্লব কর্মকার। গোটা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সভাপতি কমরেড গোপাল ঘোষ।

মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যভিত্তিক দাবিগুলির সাথে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ ও বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনের দাবিতে হরিহরপাড়ায় পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কমরেডস্ কৌশিক চ্যাটার্জী ও গোলাম আম্বিয়া প্রমুখ।

জঙ্গিপুরের সম্মতি নগরের বাজারের মধ্যে সম্প্রতি একটি মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হন। দেড় ঘণ্টা পর বিশাল পুলিশ বাহিনী এলে তাদেরকে ঘিরে ক্ষিপ্ত সহস্রাধিক জনতা বিক্ষোভ দেখায় এবং মদের দোকানের অনুমতি প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। আন্দোলনের চাপে ওসি মদের দোকান খোলা হবে না বলে ঘোষণা করেন।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ভগবানগোলায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সামসুল আলম, কমরেড শেখর সোনার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বীরভূম ঃ স্বনিযুক্তির ভাঁওতা নয় — সকল বেকারের কাজ ও বেকারভাতা, পরিচয়পত্র প্রদানের দাবিতে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড ও রামপুরহাট ৪নং পানাগড়-শেরগ্রাম এক্সপ্রেস হাইওয়ে অবরোধ করা হয়। অবরোধে বহু স্থানীয় যুবক ও সাধারণ মানুষ সামিল হন। নেতৃবৃন্দ আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন।

বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া শহরের লালবাজার মোড়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। উপস্থিত শত শত মানুষ ডি ওয়াই ও উত্থাপিত দাবিগুলির প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানান।

আগামী অক্টোবর মাসব্যাপী ব্যাপক গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে ডিএম এবং আবগারি অফিস অভিযান কর্মসূচিকে সফল করার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেড দিলীপ কুণ্ডু।

পুরুলিয়া ঃ স্বনিযুক্তির ভাঁওতা নয় — শ্রম নির্ভর শিল্প চাই, পুরুলিয়া জেলাকে খরা কবলিত ঘোষণা করতে হবে এবং খরা ঘোষণার সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রভৃতি দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে টাটা রোড অবরোধ করা হয়। স্থানীয় যুবক ও সাধারণ মানুষ অবরোধের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। এক ঘণ্টার অবরোধে পুরুলিয়া জেলা কমিটির ইনচার্জ কমরেড আলোক বসু যুব জীবনের সমস্যা তুলে ধরেন এবং তার সমাধানে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের আহ্বান জানান।

দার্জিলিং জেলার ফুলবাড়ি মোড়ে পথ অবরোধ

বর্ধমান ঃ কৃষকদের দু'ফসলি, তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণ করে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার বিরুদ্ধে এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি ও বেকারদের পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে বাসে-ট্রেনে কনসেশন দেওয়ার দাবিতে কাটোয়া থানার শ্রীখণ্ড ডাকবাংলো মোড়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ মহীতোষ কর্মকার ও কালীচরণ সর্দার।

মেদিনীপুর জেলার বেলদায় পথ অবরোধে ঢালাও মদের লাইসেন্সের প্রতীকী সার্কুলার পোড়ানো হচ্ছে

মেদিনীপুর ঃ বেলদার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে আবগারি মন্ত্রী প্রবোধ সিন্‌হার কুশপুতুল পোড়ানো হয়। খড়গপুর ইনদাতে আধ ঘণ্টা অবরোধ চলে। প্রতীকী মদের বোতল পুড়িয়ে অবরোধকারীরা বিক্ষোভ দেখায়। মেদিনীপুর শহর, কাঁথি, এগরার পানিপারুল মোড় এবং তমলুকের মানিকতলা মোড় — সর্বত্র প্রায় এক ঘণ্টা করে অবরোধ চলে। মেদিনীপুর জেলা কমিটি সম্পাদক, সভাপতি ও অন্যান্য যুব নেতারা অবরোধে নেতৃত্ব দেন। স্থানীয় যুবক ও সাধারণ মানুষ অবরোধে অংশগ্রহণ করেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন ও চাঁপাডালির মোড়ে রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। আবগারি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আন্দোলনের দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন। মদের লাইসেন্সের প্রতীকী সার্কুলার পোড়ানো হয়। জেলা সভাপতি কমরেড আবদুল আলিম, সম্পাদক কমরেড পতিত মণ্ডল আগামী দিনে যুবসমাজকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

কলকাতা ঃ কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃত্বে শতাধিক যুবক-যুবতী মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশ লাঠি চালায়। কলকাতা জেলা সম্পাদক, সভাপতি এবং সহ-সভাপতি সহ ২৪ জন আন্দোলন-কারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মহিলা আন্দো-লনকারীদের সাথে পুরুষ পুলিশ অশালীন আচরণ করে।

হাওড়া ঃ শিল্পায়নের নামে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে হাওড়া জেলা ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে উলুবেড়িয়া শহরে রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড নিখিল বেরা।

হুগলি ঃ শ্রীরামপুরে পথ অবরোধ করা হয়। আধ ঘণ্টা অবরোধ চলে। মদের প্রতীকী বোতল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ কুলতলির প্রিয়র মোড়, জামতলা, গোচরণ বাস মোড়, ক্যানিং এবং ডায়মন্ডহারবারে মিছিল ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। অবরোধ থেকে দাবি ওঠে 'কোনভাবে শিল্পায়নের নামে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না।' 'বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি রুখছি', 'পঞ্চায়েতি ট্যাক্স বৃদ্ধি মানছি না', 'মদ জুয়া সাট্টা ও অনলাইন লটারি নিষিদ্ধ করতে হবে।' কাকদ্বীপে মদের বোতলের প্রতিকৃতি পোড়ান ও পথসভা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সামনে পথ অবরোধে পুলিশের লাঠিচার্জ। আহত শতাধিক। গ্রেপ্তার ২৪।

অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে আবার ভোট রাজনীতির নোংরা খেলা

সম্প্রতি রাজ্যের বিধানসভাগুলির পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব ডি-লিমিটেশন কমিশন প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় ১০টি আসন কমছে এবং সীমান্তবর্তী জেলাগুলি সহ অন্যান্য বেশ কিছু জেলায় আসন বাড়ছে। এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুরে বাড়ছে ২টি আসন, মুর্শিদাবাদে বাড়ছে ৩টি, নদীয়ায় বাড়ছে ২টি এবং উত্তর ২৪ পরগণায় ৫টি। সীমান্তবর্তী জেলাগুলির এই আসনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ — এই অভিযোগ তুলে কিছু রাজনৈতিক দল আবার হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে। তাঁদের কারও অভিযোগ বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও ভোটার লিস্টে নাম তোলা হয়েছে। কারও দাবি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক। সকলেই লক্ষ্য করেছেন, অনুপ্রবেশ এ রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত দলগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে এ নিয়ে প্রবল সোরগোল তোলে। সমস্যাটির গভীরে যাওয়া বা এর সমাধানে সার্বিকভাবে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর এবং ঐক্যের সহায়ক যুক্তিসম্মত উপায় নির্ধারণে মত প্রকাশ করতে এদের কখনও দেখা যায় না। বরং সমস্যাটিতে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে অর্থাৎ সীমান্ত পেরিয়ে আসা মানুষগুলির বেশিরভাগই মুসলমান এবং এইভাবে সীমান্তের জেলাগুলিতে জনসংখ্যার বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে প্রভৃতি কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরে বিষয়টিকে নির্বাচনের ইস্যু করে তুলতেই তাদের বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে একথা ভাবা অসমীচীন হবে না যে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই তাঁদের এই সক্রিয়তা — যার সাথে অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানের আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই।

অনুপ্রবেশ বা ভুয়ো ভোটারই যদি সীমান্তবর্তী জেলাগুলির আসনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হয়, তবে কলকাতায় ১০টি আসন কমার কী ব্যাখ্যা তাঁরা দেবেন? যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় অনুপ্রবেশের সমস্যা নেই সেখানে ২টি আসন বেড়েছে কেন? অন্যান্য যে জেলাগুলিতে আসন সংখ্যা কমছে তারই বা কী ব্যাখ্যা রয়েছে? সকলেই জানেন, মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, পুরানো বাড়ি সংস্কারের ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচবৃদ্ধি, বহু বছর ধরে বসবাসকারী ভাড়াটিয়াদের দেয় কম ভাড়া, প্রমোটারির দাপট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে দরিদ্র নিম্নবিত্ত বাড়ির মালিকরা বাড়ি বেচে দিয়ে যেমন দ্রুত কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন, তেমনিই লক্ষ লক্ষ যে ছোট ছোট কারখানা, শিল্প, অফিস ছিল তার সিংহভাগই বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেও বহু মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে শহর ছেড়ে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এমনকী নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা বহু শ্রমিক-কর্মচারীও কর্মচ্যুত হয়ে চলে গিয়েছেন। ফলে এক ধাক্কায় কলকাতার ১০টি আসন কমে গেছে এবং জেলাগুলিতে সেই পরিমাণ আসন বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে সূত্র তারা নির্দিষ্ট করেছে তা হল, রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে (আট কোটি) মোট বিধানসভা আসন (২৯৪) দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল হবে (২.৭২ লক্ষ) তা দিয়ে একটি জেলার মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করা হবে। জেলার বিধানসভা আসনের সংখ্যা হবে এটিই। এ ক্ষেত্রে ভাগফল ০.৫০-র কম বা বেশি হলেই একটি আসন কমে বা বেড়ে যেতে পারে। যেমন হুগলি জেলার মোট জনসংখ্যাকে ২.৭২ লক্ষ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল দাঁড়ায় ১৮.৪৯। ফলে আসন সংখ্যা ১৯ থেকে কমে হচ্ছে ১৮। একইভাবে মুর্শিদাবাদের ভাগফল ২১.৫১ হওয়ায় তার আসন সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ২২। ফলে বোঝা যায় আসন সংখ্যার এই হ্রাসবৃদ্ধি জনসংখ্যার বিরাট হ্রাসবৃদ্ধির ফল নয়। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন এবার কোনও বিধানসভা এলাকাকে দুই জেলায় বিস্তৃত না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলেও কোন কোন বিধানসভায় জনসংখ্যা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটছে। তাই, এই সমস্ত কিছুর উল্লেখ না করে শুধু অনুপ্রবেশকে বিধানসভার সংখ্যা পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দেখানোটা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে এদেশে অনুপ্রবেশ সমস্যা তীব্র রূপ নেয়। সেই সময়ে সম্পাদিত নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল— দেশভাগের কারণে যারা ভারতে চলে আসবে, সরকার তাদের নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। ঐ সময়ে ওপারের বিপুল সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এদেশে চলে আসে, আবার তুলনামূলকভাবে কম হলেও এদেশ থেকেও বহু সংখ্যক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ওদেশে চলে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে আবার একটা বড় সংখ্যক মানুষ ওপার থেকে এপারে চলে আসে। শরণার্থী হিসাবে গণ্য ক'রে তাদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে ভারত সরকার। তাছাড়া মূলত দারিদ্রের কারণে হলেও, শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জিইয়ে রাখা বা সাম্প্রদায়িক উস্কানি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেও যাতায়াতের এই ঘটনা সবসময়ই ছিল।

একদা এদেশে বামপন্থীরা অনুপ্রবেশ সমস্যাটিকে একটি আন্তর্জাতিক এবং বাস্তব সমস্যা হিসাবেই দেখতেন। তাই উদ্বাস্তু মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে তারা বরাবরই সোচ্চার ছিলেন। পরবর্তীকালেও উদ্বাস্তুদের বারে বারে বামপন্থী আন্দোলনের শরিক হিসাবে দেখা গেছে। এমনকী রাজ্য সরকারের বহু নেতা-মন্ত্রীও এই আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছেন। অথচ আজ যখন রাজ্যের বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীও এই প্রশ্নে বিজেপি বা কংগ্রেস নেতাদের সাথে একই সুরে গলা মিলিয়েছেন, তখন এই সমস্ত নেতাদের বা নিচুতলার বামপন্থী কোন কর্মীকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে না। আরও অবাক ব্যাপার হল, হাজারও যে সমস্যায় দেশের জনজীবন আজ বিপর্যস্ত সেগুলি নিয়ে যে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের ন্যূনতম মাথাব্যথা নেই, সেই মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো সমস্যার তীব্রতা বোঝাতে বলেই ফেললেন যে, সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির আখড়া, যদিও তার কোনও প্রমাণই তিনি দিতে পারেননি। বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন লোকসভায় এই সিপিএম নেতার প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন করে বললেন, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীরই হোক বা পশ্চিমবঙ্গই হোক, কেন্দ্র সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। এ রাজ্যের তৎকালীন বিজেপি সভাপতি বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই শেষ ভরসা। আজও দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতা-মন্ত্রীদের সাথে এ বিষয়ে এরাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের সুরের ঐক্য। অথচ বাস্তবে কোনও সরকারই এর জন্য যে ন্যূনতম প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা নিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার অনুপ্রবেশ আটকানোর জন্য সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কোনও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

শুধু অনুপ্রবেশ নয়, সীমান্তকে ব্যবহার করে চোরাকারবার, অস্ত্রের চোরাব্যবসা, নারীপাচার, চুরি, গরুপাচার, জাল টাকার লেনদেন প্রভৃতির রমরমা কারবার গুরুতর সমস্যা হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে এই সমস্ত কিছুই আটকানোর জন্য সীমান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সীমান্তরক্ষী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও সবই অবাধে ঘটে চলেছে। চোরাকারবারীদের সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যোগসাজসের কথা আজ আর গোপন নেই। অনুপ্রবেশও অনেকক্ষেত্রেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মদতেই ঘটছে। আজ যখন বিজেপি-কংগ্রেস নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বামনামধারী রাজ্য সরকার একসুরে এইগুলি নিয়ে সোরগোল তুলছে, তখন সন্দেহ হয় তাদের এই উচ্চকণ্ঠ কতখানি আন্তরিক, আর কতখানি বিদ্বেষ জাগিয়ে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ত্রাতা হিসাবে নিজেদের জাহির করার প্রয়োজনে এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে। নাহলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুর্নীতি, চোরাকারবারীদের সাথে তাদের যোগসাজশ প্রভৃতি কঠোর হাতে বন্ধ করে এই সমস্যার অনেকখানি তারা বন্ধ করতে পারত। সেইরকম আদৌ কোন উদ্যোগ রাজ্যের মানুষের চোখে পড়ে না। অথচ সরকার ও প্রশাসনের সমস্ত রকমের অপদার্থতা ও দুর্নীতির দায় বহন করতে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্যে সীমান্তের এলাকাগুলিতে মানুষের মান-প্রাণ-সম্পত্তি নিয়ে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছে।

অনুপ্রবেশ সমস্যা বিচার করতে গিয়ে আমাদের স্মরণে রাখা দরকার যে, জীবিকার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা। জীবিকার সন্ধানে মানুষ চিরকাল এভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। এইভাবেই যুগে যুগে সভ্যতার, সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটেছে, বিকাশ ঘটেছে। একদিন আর্যরাও এইভাবেই ভারত ভূখণ্ডে এসেছিল। আজ জনসংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সমস্যার সাথে জীবিকার সমস্যাও বেড়েছে। আজও যখন, একই জাতীয় গণ্ডির মধ্যে বসবাস করতে থাকা একই ভাষাভাষী এবং একই সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠীকে শাসকশ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কৃত্রিমভাবে দুটি পৃথক স্বাধীন জনমণ্ডলী তথা দেশে বিভক্ত করা হয়, তখন পুরানো এই ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর একই ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা পারস্পরিক যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা, তাকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যাতায়াত কখনও বন্ধ করা যায় না। কোন প্রহরা, কোন কাঁটাতারের বেড়া তাকে আটকাতে পারে না। এ ঘটনা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে তাই নয়, পৃথিবীর যেখানেই একই ভাষাভাষী কোন জাতিকে এভাবে পৃথক করা হয়েছে সেখানেই এ জিনিস ঘটছে। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে যারা আসছে তারা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত গরিব মানুষ। দেশে যাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা আছে, আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তারা কখনও সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসে থেকে যায় না। প্রতিদিন চিকিৎসার প্রয়োজনে, শিক্ষার প্রয়োজনে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, আত্মীয়তার সূত্রে শত শত মানুষ বাংলাদেশ থেকে এপারে আসে— তারা কেউ থেকে যায় না। কিছু দরিদ্র মানুষ প্রতিদিনই এপারে এসে জনমজুরি, কুলিগিরির কাজ করে আবার ফিরে যায়। এদেরই একটা অংশ কোন স্থায়ী কাজ যোগাড় করে বা যোগাড়ের আশায় এপারে থেকেও যায়। সকলেই জানেন, এইভাবে যাতায়াত করতে গিয়ে বহু সময়ই তাদের পুলিশি হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। এমনকী গ্রেপ্তার হয়ে পুলিশি অত্যাচার সহ্য করে দীর্ঘ জেলভোগও করতে হয়।

অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশ থেকে দরিদ্র মানুষের এই আসা-যাওয়া বিশ্বজুড়েই রয়েছে। কারণ পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে, দেশে দেশে মেহনতি মানুষের কাজের সুযোগও ততই কমছে। হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নতুন যা-ও দু-একখানা খুলছে, তা-ও ক্যাপিট্যাল ইনটেনসিভ, অর্থাৎ অত্যাধুনিক মেশিনচালিত। সেগুলিতে নতুন কাজের তেমন কোন সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। ফলে শ্রমিকশ্রেণী কাজের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। এ রাজ্যের যুবকরাও পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট থেকে শুরু করে যেমন সারা ভারতেই ছুটে বেড়াচ্ছে, তেমনই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বা এমনকী আমেরিকা ইংল্যান্ডেও এদেশের হাজার হাজার যুবক কাজের খোঁজে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এদের একটা অংশ যেমন এই দেশগুলিতে বৈধ উপায়ে প্রবেশ করে, তেমনই বাকি অংশের প্রবেশের যে বৈধতা থাকে না, তা তো সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকারও জানে। একদিন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকট যখন এতখানি তীব্র ছিল না, তখন সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলি এটিকে একটি সমস্যা বলেই মনে করত না। বরং সস্তা শ্রমশক্তির প্রয়োজনে এই অনুপ্রবেশকে তারা অনুমোদনই করেছে।

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, গরিব মানুষের আজ কার্যত কোন দেশ নেই। তীব্র শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী সমাজ তাদের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন করেছে, ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে উদ্বাস্তু করেছে, বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম রোজগারের সুযোগও কেড়ে নিয়ে সমস্ত দিক থেকেই তাদের সর্বহারায় পরিণত করেছে। ফলে দেশ বলতে যা বোঝায়, সর্বহারা মানুষগুলির জন্য সত্যিই কোথাও তা আছে কি? পুঁজির মালিকদের যাতায়াতে কিন্তু এমন কোনও বাধানিষেধ নেই। শুধু তাই নয়, পুঁজির মালিক যেসব ভারতীয় বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানেই বাস করে, তাদের জন্য ভারত সরকার দ্বৈত নাগরিকত্ব পর্যন্ত দিচ্ছে এদেশে তাদের পুঁজি আনার জন্য। তাদের যদি আবাহন করে আনার জন্য আধুনিক হোটেল, প্রমোদের জন্য হরেক আয়োজন, যাতায়াতের জন্য মসৃণ পথঘাট সরকার বানিয়ে দিতে পারে, তবে যাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে এই পুঁজির সৃষ্টি, সেই শোষিত নিঃস্ব শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা করা যাবে না কেন?

আরও একটি জিনিস আমাদের ঠিকঠিকভাবে বিচার করে দেখতে হবে, যা না পারলে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিই এর থেকে লাভবান হবে এবং শোষিতশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের চরম ক্ষতি হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়নকে কেন্দ্র করে যে ক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, অনুপ্রবেশকে ইস্যু করে তাকে উস্কে দিয়ে যারা ভোটের রাজনীতিতে ফয়দা তুলতে চায়, তারা বোঝাতে চায় সাধারণ মানুষের যত দুরবস্থা— বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই— সবকিছুর জন্য দায়ী সীমান্ত পেরিয়ে আসা এই মানুষগুলি। অথচ আমরা যদি সঠিকভাবে বিচার করি, তবে দেখব এর একটির জন্যও এই মানুষগুলি দায়ী নয়। দেশজুড়ে হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ, নতুন কারখানা স্থাপিত হচ্ছে না, বেকার সমস্যা ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। এর জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী ? না, দায়ী শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, যেখানে মালিকশ্রেণী দেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে করতে এতদূর নিঃস্ব করেছে যে তাদের আর ক্রয়ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে দেশে মালিকশ্রেণীর উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার নেই। তাই যেমন পুরানো কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, তেমনই নতুন কলকারখানা খুলছে না। অর্থাৎ এই বেকার সমস্যার জন্য

চারের পাতায় দেখুন

জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির জন্য কি অনুপ্রবেশ দায়ী ?

তিনের পাতার পর

মুনাফাখোর এই মালিকীব্যবস্থাই দায়ী। বিদ্যুতের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি আজ সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে, হাসপাতালের চার্জ বাড়ছে — এর জন্য কে দায়ী? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি মেনে দেশের শাসকশ্রেণীর ধামাধরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বিদ্যুৎক্ষেত্রে যে ঢালাও বেসরকারীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে, তার ফলে এতদিন পর্যন্ত পরিষেবা হিসাবে যে বিদ্যুৎকে দেখা হত তা আজ মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এর জন্য দায়ী অনুপ্রবেশ নয়। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধিও আজ মালিকশ্রেণীর অবাধ মুনাফার লোভ থেকেই ঘটছে। একদিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ যখন দারিদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি পুঁজির পাহাড় তৈরি করছে। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা— এ সবকিছুও পুঁজিবাদী মুনাফার কবলে পড়ে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া যে সমস্ত জেলায় বা রাজ্যে অনুপ্রবেশের সমস্যা নেই সেখানেও কী জনজীবনের সমস্যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে বিন্দুমাত্র পৃথক ? এরাজ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলাগুলির দুরবস্থা স্বাধীনতার ছ'দশককেও যেমন অনড় হয়ে রয়েছে তেমনি, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ হাজারও একটা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে বোঝাই যায়, সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে, পুঁজিবাদী শোষণমূলক এই সমাজব্যবস্থাই। এই মূল শত্রুকে আড়াল করার জন্যই অনুপ্রবেশকে একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে জনগণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।

যেসমস্ত রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশ নিয়ে হৈচৈ করছে, সাধারণ মানুষের এই মূল সমস্যাগুলি নিয়ে তারা কিন্তু নীরব। ভোটে ফয়দা তোলার উদ্দেশ্যে লোকদেখানো কিছু বক্তৃতা, বিবৃতি, সভাসমাবেশ ছাড়া জনজীবনের এই জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে তাদের কোন লাগাতার কার্যকরী প্রতিবাদ আন্দোলন নেই। তাদের উদ্দেশ্য— জনগণের সমস্ত প্রকার দুরবস্থার জন্য দায়ী যে পুঁজিবাদ তাকেই জনসাধারণের ক্ষোভ থেকে আড়াল করা এবং পুঁজিপতিশ্রেণীকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমতার ভাগ পাওয়া। সাধারণভাবে অনুপ্রবেশ সমস্যাটি নিয়ে তারা যে আদৌ চিন্তিত নয়, বরং সমস্যাটিতে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে মানুষের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করাই যে তাদের আসল উদ্দেশ্য, তা সীমান্ত পেরিয়ে আসা হিন্দুদের শরণার্থী এবং মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী নামে অভিহিত করা থেকেই বোঝা যায়।

সকলেই লক্ষ্য করেছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে রাজজুড়ে রথযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করে দিয়েছে। এবং এ কারণে রাজ্যে কোন প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সরকার দায়ী থাকবে বলে হুমকিও দিয়েছে। অর্থাৎ সমস্যার সমাধান অপেক্ষা ভোটের স্বার্থে তাকে কাজে লাগানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তৃণমূল কংগ্রেসও ভোটের দিকে তাকিয়ে অনুপ্রবেশটিকে ভোটের ইস্যু করে তুলতে চাইছে। আবার এদেশে যেমন বিজেপি সহ মুসলিমবিরোধী শক্তিগুলি অনুপ্রবেশের নামে মুসলমান বিরোধী জিগির তুলে মানুষের মূল সমস্যাগুলিকে গুলিয়ে দিতে চাইছে, তেমনই বাংলাদেশেও মৌলবাদী শক্তিগুলি সক্রিয়। তারাও ভারতবিরোধী জিগির তুলে সেখানকার মানুষের মূল শত্রু যে সে দেশের পুঁজিবাদ সেই সত্যটাকেই গুলিয়ে দিতে চাইছে। উভয় দেশের এই শক্তিগুলির মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়— তা হল উভয়েরই কারবার মিথ্যা নিয়ে, ধর্মের নামে আসলে তারা অধর্মেরই চর্চা করে। এই মৌলবাদী শক্তিগুলি সম্পর্কে উভয়দেশের সাধারণ মানুষকে সাবধান থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আজ অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে যে অন্ধকার নেমে এসেছে তার জন্য দায়ী বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আর তাকে রক্ষা করছে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র — তার মিলিটারি, পুলিশ সহ আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সবচাইতে লাভবান হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণী। ফলে তারা এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলগুলি সর্বপ্রকারে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তাই একদিকে যেমন তারা চূড়ান্ত দমনপীড়ন চালিয়ে জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে দমন করছে, অন্যদিকে জনগণ যাতে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে তার জন্য জনগণের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে এবং এই কাজে ধর্মকেও ব্যবহার করছে।

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে

জেলায় জেলায় শ্রমিক সম্মেলন

মেদিনীপুর

গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর উদ্যোগে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তৃতীয় শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তমলুক শহরে। শুরুতে এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সহ-সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের পক্ষে অনুপ অগস্তি, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (নব পর্যায়) অজিত সামন্ত, অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়নের পক্ষে মানবেন্দ্র সরকার। কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, আজকের দিনে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার ও মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কমরেড সৌমেন বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন — প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি আজ আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে শ্রমিক শ্রেণীকে বাস্তবে মালিকশ্রেণীর গোলামী করতে বাধ্য করছে। তিনি অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ ও কানুনী বেড়াজালের বাইরে গিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি অধিবেশন হয় তমলুক কলেজ অডিটোরিয়াম হলে। বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা ও এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা। কমরেড বিপ্রদাস গুপ্তকে সভাপতি ও কমরেড সিদ্ধার্থ মহাপাত্রকে সম্পাদক করে ২৮ জনের জেলা কমিটি ও ১৮ জনের কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

কলকাতা

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর আসন্ন রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে জেলাস্তরে সম্মেলন চলছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর মৌলালি যুবকেন্দ্রে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পূর্বে কলকাতা জেলার অন্তর্গত প্রতিটি ইউনিট ও শিল্প ইউনিয়নের সম্মেলন হয়। এইসব সম্মেলনে একদিকে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি ও কার্যক্রমকে হাতিয়ার করে মালিক শ্রেণী সরাসরি শ্রমিক কর্মচারীদের উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তা মোকাবিলায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজনীয় আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সর্বত্র সংগঠনের কমিটি গঠন করা হয় এবং জোনাল সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। কলকাতা জেলাকে কয়েকটি জোনে ভাগ করে জোনাল সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসব সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জেলা সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত ৪০৩ জন প্রতিনিধি কলকাতা জেলা সম্মেলনে যোগ দেন।

৩ সেপ্টেম্বর মৌলালি যুবকেন্দ্রে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কলকাতা জেলা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ। (উপরে) মঞ্চে উপবিষ্ট জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সকাল ১০টায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা কমরেড সনৎ দত্ত রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এছাড়াও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্হা, রাজ্য কমিটির সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড দীপক দেব। সম্মেলন পরিচালনার জন্য জেলার বিশিষ্ট নেতা কমরেডস তিমির বরণ ঘোষ, অমল করগুপ্ত, কে জি সাহা ও প্রদীপ চৌধুরীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভার শুরুতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমরেড সনৎ দত্ত। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গীত গোষ্ঠী।

কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড দীপক দেব বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি, পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষের অসহনীয় অবস্থা, সাংগঠনিক সমস্যা ও তা দূরীকরণ এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় শ্রমিক-কর্মচারী ও সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় ভূমিকার উপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের সমর্থনে কমরেড বিমল জানা ও কমরেড সমর সিন্হা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও এই সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপরে ৭৩ জন প্রতিনিধি নানা সংযোজন ও সংশোধন সহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত, সহ-সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, সহ-সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য। কমরেড বঙ্কিম বেরাকে সভাপতি ও কমরেড শান্তি ঘোষকে সম্পাদক করে ৩১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

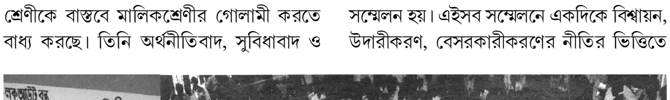

৩ সেপ্টেম্বর তমলুকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে টেক্সটাইল ক্ষেত্র

কোটা-উত্তর পর্বে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান ও অর্থনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে বিপর্যয় প্রসঙ্গে

আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশে টেক্সটাইল ক্ষেত্রটি কেমন একটু দেখা যাক।

এই ক্ষেত্রে "১৮ থেকে ২০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মহিলা। U.N. Development Fund এর হিসেব অনুযায়ী এর মধ্যে ১০ লক্ষ শ্রমিকই কোটা প্রথা বাতিলের পর তাদের কাজ হারাবে।" (প্রতিদিন ঃ বিশেষ নিবন্ধ, ২১.১.০৫) ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'চীন ও ভারতের সস্তা ও উন্নত পণ্যের ফলে বাংলাদেশে বিপুল মানুষের কাজ হারাবার সম্ভাবনা।' [The Statesman, 13.1.05] বাংলাদেশের বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ দল WTOকে দরবার করে জানিয়েছে ঃ 'এসব কাজে খুবই অল্প শিক্ষিত মহিলারা যুক্ত, যারা একাজ হারালে অন্যত্র কাজ পাবে না।' [The Statesman -ঐ] অর্থাৎ এই মহিলা শ্রমিকরা বিশেষভাবে কাজ তো হারাবেই, এমনকী অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা কাজ পাবে না। বলাবাহুল্য অপ্রত্যক্ষভাবে টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ও নির্ভরশীল ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি অপরাপর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবনেও বাংলাদেশে বিপর্যয় নেমে আসবে। বাংলাদেশ সরকারের এটাই হিসেব। ২০০২-এ বাংলাদেশ আমেরিকার বাজারের মাত্র ৪% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারের ৩% রপ্তানী করেছিল যার পরিমাণ ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের বিদেশী মুদ্রার চার ভাগের তিনভাগ আমদানী হয় এই বাণিজ্যে। ভবিষ্যতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে, আমদানী-রপ্তানীর অসাম্য সামাল দিতে আন্তর্জাতিক লগ্নীকারী সংস্থার কাছ থেকে বাংলাদেশকে অনেক বেশী ঋণ নিতে হবে, কঠিনতর শর্তে। এই টাকা তুলতে বাড়বে ট্যাক্সের বোঝা। পুঁজিপতিরা পার পেয়ে গেলেও মরবে জনতা। অবশ্য কোটা ব্যবস্থা থাকার দরুণ শ্রমিকদের হাল ভাল কিছু ছিল না। সস্তা মজুরদের বর্বরভাবে শোষণ করেই "বৈদেশিক বাণিজ্যের" অথবা "জাতীয় আয়ের" তথাকথিত বাড়বাড়ন্ত, যা উন্নয়নের নামে চলছিল। যে জামা বিদেশে ১৮০০ টাকায় বিক্রী হয় তা তৈরী করতে ১৫ টাকা মজুরীও পেত না শ্রমিকরা। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে এই শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী যে আন্দোলন হয়ে গেল কিছুদিন আগে তার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল ৮ ঘণ্টার কাজ! (সূত্রঃ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্র 'ভ্যানগার্ড')

পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান কোটা প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষে বরাবরই সোচ্চার। গত বছর পাকিস্তান তুলো আমদানী করেছে ১.৯ মিলিয়ন বেল। তৈরী পোষাক ইত্যাদি রপ্তানী মারফৎ তৃতীয় বৃহত্তম তুলো আমদানীকারক দেশটির ১২ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বাণিজ্যের তিনভাগের দুইভাগই দখল করেছে টেক্সটাইল বাণিজ্য। এই শিল্পে কাজ করে ১৪ লক্ষ লোক, জিডিপি'র ১১ শতাংশ আসে টেক্সটাইল ক্ষেত্র থেকে। এখানেও দেখানো যায় শ্রমিকদের জীবনে সমস্যা একই। আসলে বেল পাকলে কাকের কি? পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা মুনাফা বাড়িয়েছে প্রচুর। কিন্তু শ্রমিকদের জীবন দাসদের মতই। বাজারের উপর দখল রাখতে, সংকুচিত বাজার থেকে মুনাফা তুলতে পাকিস্তানকেও উৎপাদন খরচ কমাতে হবে, প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে আরও ছাঁটাই করতে হবে। টাকার অঙ্কে যাই হোক, প্রকৃত মজুরী অনেক কমাতে হবে। ঋণ নিতে হবে কঠিন শর্তে। মালিকদের মুনাফাকে 'জাতীয় আয়', 'জাতীয় উন্নয়ন' বলে যেভাবে চালানো হচ্ছিল, তা চালানো হবে। বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলির সম্পর্কে IMF এবং WTO বলতে বাধ্য হচ্ছে যে এরা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে। কারণ এদের রপ্তানী বাণিজ্যের ৭০% দখল করে আছে টেক্সটাইল। এই তথ্যটি পরিবেশন করছে 'সাউথ চায়না মর্নিং পোষ্ট'। 'ওয়াশিংটন পোষ্ট জানিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার মোট টেক্সটাইল বাণিজ্যে রপ্তানীর ৯৩% যেত আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে। ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের দেশে ৪,৫০,০০০ কাজ করত এই ক্ষেত্রে। সমগ্র অর্থনীতির ১৫% এই সেক্টর। মোট রপ্তানীর ৬৫% হল টেক্সটাইল পণ্য। সুতরাং কোটা ব্যবস্থার দরুণ যে বিদেশী বাজার তাদের ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে সেই বাজার তারা হারাবে। অন্তত ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ হারাবে। শতাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রীলঙ্কার বাণিজ্যমন্ত্রীও এটা স্বীকার করেছেন। 'বিজনেস উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় ইন্দোনেশিয়ার ১৭ লক্ষ টেক্সটাইল শ্রমিকের মধ্যে ১০ লক্ষই ছাঁটাই হয়ে যাবে। [The Statesman–13-1-05]

নেপালে ধ্বস নামবে

ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালের অর্থনীতিতে টেক্সটাইল ক্ষেত্রটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে প্রায় ৫০ হাজার টেক্সটাইল শ্রমিক আছে। এর মধ্যে আবার ৬০ শতাংশ মহিলা। এই শিল্পের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে যুক্ত শ্রমিক আরও ৫০ হাজার। এক ধাক্কায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাবে। এই সব শ্রমিক পরিবারের ৩,৫০,০০০ লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তা লুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই মর্মে ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

ভারতবর্ষ ঃ টেক্সটাইল বাণিজ্যের স্বরূপ ও সংকটের বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষে ২০০০-০১ সালে বয়নশিল্প জিডিপি-তে ৪ শতাংশ অবদান রেখেছে, শিল্প উৎপাদনের ১৪ শতাংশ, বৈদেশিক বাণিজ্য আয়ের ২৭ শতাংশ দখল করে আছে। শিল্পে কর্ম সংস্থানের নিরিখে এর অংশ ১৮ শতাংশ। অর্থনীতিতে অবদান ও কর্মসংস্থানের বিচারে কৃষির পরেই স্থান বয়ন শিল্পের। বিশ্ব বাণিজ্যে টেক্সটাইল ক্ষেত্রের ৪ শতাংশ এবং পোষাক শিল্পে ৩.৪ শতাংশ ভারতের দখলে। ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০১-০২ পর্যন্ত টেক্সটাইল ও পোষাক শিল্পে রপ্তানী বৃদ্ধি হয়েছে ৮.৫ শতাংশ হারে। ১৯৯৯-এ টেক্সটাইলের বাণিজ্যে বিদেশী মুদ্রা আয় তহবিলে ২৩৯৮০ কোটি টাকা এবং পোষাক শিল্প ২৪৮৩০ কোটি টাকা এনে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুতো উৎপাদনের নিরিখে ভারতবর্ষ এখন দুনিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে। WTO ভবিষ্যৎ বাণী করছে ভারতবর্ষের বাজার বাড়বে। ৪ শতাংশ দখলী জমি বেড়ে বিশ্ব বাজারে সে ১৫ শতাংশের দখল নেবে! সুতির ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ উৎপাদনই হয় সংগঠিত ক্ষেত্রে। ফেব্রিক বা কাপড়ের ক্ষেত্রে আগের মোট উৎপাদনের ৯৫ শতাংশের বেশি উৎপাদন হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলিতে। অর্থাৎ বিকেন্দ্রীভূত হস্তচালিত তাঁত, শক্তি চালিত তাঁত এবং নিটিং ইউনিট গুলোতে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়টাতে সংগঠিত বয়নশিল্পে বিস্তারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। ১৯৮৫-তে তা প্রত্যাহার করা হয়। বৃহদায়তন বয়ন শিল্পের ওপর জোর দিতেই তা করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে যেখানে দেশের মোট উৎপাদিত ফেব্রিকের ৭০ শতাংশ ছিল সংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান, ২০০৪ সালে তা নেমে আসে ৪ শতাংশে। আরও নিখুঁত বললে ১৯৫১-তে ৭০.১৯% ছিল আর ২০০৪-এ ৩.৪৪%। ২০০১ সাল পর্যন্ত ভারতের পোষাক শিল্প পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ক্ষেত্রের জন্য (এস-এস-আই সেকটর)। বুনন ও নিটিং শিল্প অবশ্য এখনও এভাবে সংরক্ষিত। ক্ষুদ্র আয়তনের দরুণ বিনিয়োগ, উৎপাদনশীলতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক থেকে বহু দেশের থেকেই ভারতবর্ষ পিছিয়ে আছে। উৎপাদিত দ্রব্য সঙ্গত কারণেই বেশী দামের হওয়ায় প্রতিযোগিতায় পারছে না। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ছোট ছোট টেক্সটাইল ইউনিটের রক্ষা কবচ যেমন বাতিল হয়ে গেল, তেমনই জোর দেওয়া হ'ল বৃহৎ কারখানা ও আধুনিক প্রযুক্তির ওপর। এজন্যই ১৯৯৯ সালে সরকার তৈরী করল টেকনোলজি আপগ্রেডেশন ফাণ্ড স্কীম (TUFS)। পাশাপাশি ২০০০ সালে চালু করা হল তুলো সংক্রান্ত একটা প্রযুক্তি মিশন (Technology Mission on Cotton–TMC)। তুলোর গুণমান, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির প্রতি মায়া ত্যাগ করে ফান্ড স্কীমের বদান্যতায় এই শিল্পক্ষেত্রকে বৃহদায়তন করার জন্য ২৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে ৯৫০০ কোটি টাকা ঋণ। বিদেশের বাজার ধরবার জন্য বয়নশিল্পে দু'ধরনের শুল্ক কাঠামো তৈরী হয়েছে। এক) অন্তঃশুল্ক দিতে হবে এবং উৎপাদনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের প্রদত্ত শুল্কের উপর কেন্দ্রীয় মূল্যযুক্ত কর ঋণ পাওয়া যাবে। দুই) অন্তঃশুল্ক একবারেই দিতে হবে না। ভারতীয় কটন শিল্প ফেডারেশন 'ভিসন স্টেটমেণ্ট' প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হচ্ছে ২০১০ সাল নাগাদ এদেশে বয়ন ও বস্ত্রশিল্প ক্ষেত্রের মোট বাণিজ্যিক পরিমাণ বর্তমানের ৩৬০০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৮৫০০ কোটি মার্কিন ডলার হবে। এইক্ষেত্রে রপ্তানী বাণিজ্য পরিমাণ ১২০০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে হবে ৪০০০ কোটি মার্কিন ডলার। লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে আধুনিকীকরণের জন্য দরকার ১,৪০,০০০ কোটি টাকা। কেবল প্রক্রিয়াকরণের জন্যই লাগবে ৫০,০০০ কোটি টাকা। পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিজ্ঞা টেক্সটাইল ক্ষেত্রকে আর সূর্যাস্তের শিল্প (sun set industry) বলতে দেবে না। (সূত্র ঃ যোজনা পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ডি. কে. নায়ার)

এতসব কাণ্ডের ফলাফলগুলো এবার দেখা যাক। এক) তুলো সংক্রান্ত আধুনিকীকরণের ফলে তুলোর চাহিদা ও যোগানের ফারাক কমছে। ফলে তুলোর দাম কমেছে। ফলে হাজার হাজার তুলোচাষী আত্মহত্যা করেছে। দুই) ক্ষুদ্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ২০ লক্ষ বয়নশিল্পী তাঁতী ভিখারীতে পর্যবসিত হবে। এবং হচ্ছেও তাই। তৃতীয় সেনসাস রিপোর্টে (২০০১-০২) ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধের হার ৫২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০ শতাংশ। এর অন্যতম কারণ হল এগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের অভাব। সাধারণ এই পটভূমিতে বর্তমানে অসংরক্ষিত বয়ন শিল্পের অবস্থা কত দূর ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠবে তা অনুমান করা কি কঠিন? গ্রাম শহরে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি হাড্ডিসার চেহারাগুলি দেখলে কি বোঝা যায় না—দেশের বাজারটা কি রকম?

আমেদাবাদের তাঁতী ও ছোটখাটো বস্ত্র কারখানার মালিকদের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও তার প্রভাব নিয়ে একটা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এতে দেখা গেছে এদের ৮৬ শতাংশ যারা কাঁচামাল জোগাড় করে নিজেদের ছোটখাটো যন্ত্রে কাপড় বুনে থাকে তাদের ৪৫ শতাংশ রুজি রোজগার হারিয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ এমন মানুষ ধনেপ্রাণে মারা যাচ্ছে। (আন্তর্জাতিক বস্ত্র বাণিজ্যে মতুন যুগের সূচনা ঃ রীমা চক্রবর্তী, যোজনা ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৫)

তিন) বয়নশিল্পের আপগ্রেডেশনের ফলে ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই হবে। যা সাধারণভাবে গোটা দেশের বাজারের ক্রয়ক্ষমতাকে সামগ্রিকভাবে সংকুচিত করবে, যার পরিণতিতে বাজার সংকট বাড়বে। ফলে বাণিজ্য সংকট বাড়বে। এছাড়া মজুরী হ্রাস পাবে। পলিয়েস্টার ফিলামেণ্ট ইয়ার্ণ ছাড়া বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল সহ অন্যান্য তন্তুতে অন্তঃশুল্ক রদ করা হয়েছে। তাছাড়া বস্ত্র এবং বস্ত্র সামগ্রীতে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য) আইন বিলোপ করা হয়েছে। বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশে অন্তঃশুল্ক কমে ৫ শতাংশ হয়েছে। ২০০৪-০৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের এই সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা সরকারের আয় যে কমবে—মালিকরা যে বাড়তি সুবিধা পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। (যোজনা ঃ প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো -ঐ)

চার) মালিকদের শুল্ক ও কর ছাড় দেওয়ার ফলে সরকারের আয় কমবে। আয় ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে জনগণের ওপর কর-ভার বাড়ানো হবে। বাড়বে বৈদেশিক ঋণ ও সুদের বোঝা।

পাঁচ) বিপুল পুঁজির যোগান দিতে একদিকে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাই বেশি বেশি করে করা হবে, অপর দিকে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে জোটবদ্ধতার প্রবণতা এই ক্ষেত্রটিতে বাড়বে। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী পুঁজিজোটের লুণ্ঠন বাড়বে। বস্ত্রশিল্পে বাণিজ্যযুদ্ধের পরিণামে আরও বৃহৎ পুঁজির জন্ম নেবে পুঁজি সংমিশ্রণের ফলে। অর্থনীতির টেক্সটাইল ক্ষেত্রের গতি প্রকৃতির সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে একটা বক্তব্যে ঃ কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী এস বাঘেলা বলেছেন, 'বস্ত্রশিল্পে ক্ষুদ্র আর সুন্দর নয়।' [2.1.05 The Statesman] সুতরাং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও IMF থেকেও ঋণ তোলা হবে পুঁজির শক্তি বাড়াতে। অবশ্য তা নেওয়া হবে 'উন্নয়ন', 'দেশের স্বার্থ', 'পরিকাঠামোর উন্নতি' এসব নানা নামে। সুদ গুণতে হবে অবশ্য আমজনতাকেই। যেমন মাননীয় বাঘেলা ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন, 'বস্ত্রশিল্পে ঋণের উপর ৩ শতাংশ সুদ ভরতুকি হিসাবে দিতে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই রাজি হয়েছে।' শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করে তিনি আরও বলেছেন, 'আমদানি শুল্ক আর বাড়ানো হবেনা'। অর্থমন্ত্রীকেও পরামর্শ দিয়ে বলেছেন ঃ শিল্পের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে শুল্ক কমাবার বিষয়টা তিনি যেন বিবেচনা করেন। [The Statesman 21-1-05]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি ও তার সাধারণ রূপ সম্পর্কে

দুনিয়ার সব পুঁজিবাদী দেশেই এই প্রবণতাগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই দেখা দেবে। কোটার সুবিধা পাওয়া এবং না-পাওয়া দেশের সর্বত্র শ্রমিক ও জনগণের জীবন একই ধরনের কর বোঝা, মূল্যবৃদ্ধির চাপ, ক্রমবর্ধমান বেকারিত্বের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে উঠবে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়ে উঠবে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ। বিশেষভাবে টেক্সটাইল শিল্প ক্ষেত্রটি হয়ে উঠবে বারুদের মত। এ জন্য মালিকরা ভয় পাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আইন বদলানোর প্রস্তাব উঠেছে। টেলিকমের মতো এই ক্ষেত্রে চুক্তি-নিয়োগ ও অবাধ ছাঁটাই করার অধিকার চাইছে। বলছে শ্রমিকদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারই থাকবে না। .... radical changes should be made in the Trade

ছয়ের পাতায় দেখুন

টেক্সটাইল শ্রমিকদের উপর আক্রমণ বাড়বে

পাঁচের পাতার পর

Union Act to prevent general trade union office bearers from represnting workers of individual textile units. [Business India, p-30, January 2005] পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এই প্রবণতা একটা সাধারণ ধারা হিসাবে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক স্তরে কোটা-উত্তর কালে এই শিল্প ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিশিষ্টতা দেখা দেবে। এক) পুঁজিবাদী বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ ও সন্ধি চুক্তির সম্ভাবনার বিকাশ। দুই) ভারতবর্ষের মতো দেশের সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজি অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশের বাজারে থাবা বসাবে। তিন) বস্ত্র জগতের দৈত্যাকার ৪০টা কোম্পানির মধ্যে ২০টা কোম্পানি আমেরিকায় অবস্থিত। দুনিয়ার পোষাক ও বস্ত্র বাণিজ্যের ৮০% তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। এই দৈত্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জায়গা দখল রাখতে ও বাড়াতে হলে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে নানা ধরনের এলাকা ভিত্তিক জোট গড়ে উঠবে যাদের মধ্যে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা, এমনকি বিনা শুল্কে সুবিধার শর্ত থাকবে, বাজার দখল ঠেকাতে এগুলি এক ধরনের প্রাচীর হয়ে কাজ করবে। যেমন কানাডা মেক্সিকো এবং সাহারা সন্নিহিত আফ্রিকা ও ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে নাফটার (আমেরিকা) বাণিজ্য উন্নয়ন চুক্তি উল্লেখ করা যায়, যার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে ভারতীয় রপ্তানীর ওপর। (যোজনা, ফেব্রুয়ারি '০৫) গড়ে উঠবে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও জোটবদ্ধতার ফলে বিশ্বপর্যায়ে নতুন দৈত্য। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মধ্যে মুষ্টিমেয় দৈত্যাকার কয়েকটা কর্পোরেট হাউস বিশ্ববাজারকে কার্যত নিয়ন্ত্রণ করবে। কোটার সুবিধাপ্রাপ্ত দেশেও বর্তমানে কারখানা বন্ধ হবে। যেমন হয়েছে আমেরিকায় ১৩০০টি। কোটার আগেও এমনটাই ছিল। কোনো দৈত্যকে মেরে নতুন দৈত্য গজাতে পারে। দেশের মধ্যেও এমন খতম অভিযান চলবে বাজার সংকটের দরুণ। NTC-র মিলগুলো বিক্রি করে ৭৯০০ কোটি টাকা তোলা হবে বলে বাঘেলা জানিয়েছেন। (৭-৩-০৫ আনন্দবাজার) লগ্নী-পুঁজির সংঘর্ষ—ক্রমশঃ তীব্র হবে। ভারতীয় পুঁজিকেও তীব্র যুদ্ধে নামতে হবে বিশেষজ্ঞরা একথা বলছেন। প্রতিদিন প্রমাণ হচ্ছে, WTO বাণিজ্য যুদ্ধ কমাতে পারেনি। বরং হয়েছে উল্টোটাই। বস্ত্রশিল্প জগতে লগ্নীপুঁজির ফাঁসে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির নাভিশ্বাস উঠবে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতা কর্ম সংস্থান ক্ষেত্রে কোনো আলোই দেখাতে পারবে না। এই প্রযুক্তির টোপ দেখিয়ে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশ সরাসরি বিদেশী পুঁজি (FDI) বিনিয়োগের পথ খুলে দিচ্ছে। অর্থাৎ লগ্নীপুঁজির শোষণের ক্ষেত্র অবাধ করে দিচ্ছে। বস্ত্র বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এ দেশেও এই প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে পুঁজির সমস্যা মেটাতে, একথা বলছেন স্বয়ং বাঘেলা সাহেব। এমন অবস্থায় বস্ত্র শিল্প শ্রমিকদের দুরবস্থা ও সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থা কোথায় গিয়ে পৌছাবে তা অনুমান করা যায় না কি?

সংস্কারবাদী বেড়াল তত্ত্ব প্রসঙ্গে

অর্থনীতির বুর্জোয়া পণ্ডিতরা বলেছেন যে, শিল্প ক্ষেত্রে নাকি ১ কোটি ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। এর জন্য ক্রিসিল-এর সমীক্ষা অনুসারে ৫০ লক্ষ কাজ পাবে টেক্সটাইলে। (সূত্র ঃ যোজনা, ঐ, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো) যা কার্যত অসম্ভব। রাষ্ট্রনায়কদের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি এক জঘন্য প্রতারণা। সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এইরকম গল্প শোনাচ্ছেন। 'বিশ্বায়নের সুযোগ নিতে হবে,' তাই পুঁজি ডেকে আনতে হবে। সিপিএমের সাম্প্রতিক পার্টি কংগ্রেসও এটাই মনে করে। বাংলার শিল্প-বন্ধুর বক্তৃতায় শিল্পমহল খুশী। তাদের জন্য কত রকম সুযোগ। কত ঋণ ছাড়, কত কর মকুব, উদ্যোগের জন্য দান! এমন কত কি? কথায় কথায় তারা চীনের কথা আওড়াচ্ছেন। চীনে গিয়ে ওরা আবার তদন্ত পর্যন্ত করে এসেছেন। সমাজতন্ত্রের (!) চীনা মডেলটি তাঁদের বড়ই প্রিয়। সমাজতন্ত্রের (!) ঐ মডেলটি আনতে গিয়ে সংস্কার কর্মসূচীকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে তেং-শিয়াও-পিং-কে এক তত্ত্বের আমদানী করতে হয়েছিল ঃ বেড়ালতত্ত্ব। 'বেড়াল সাদা হোক বা কালো হোক, তাতে কিছু এসে যায় না ; ইঁদুর ধরতে পারলেই হলো।' একথাগুলো এখন অনিলবাবু, বুদ্ধবাবুরাও আওড়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে চমৎকার কথা আছে। চীনের সংগ্রামী চাষী মজুররা অভিজ্ঞতার নিরিখে ব্যঙ্গ করে এই বেড়াল তাত্ত্বিকদের বলতো ঃ 'বেড়াল সাদা হোক, কালো হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। এমনকি সে বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে কিনা, তাতেও কিছু এসে যায় না, বেড়ালটার নিজের ধরা না পড়াটাই আদত কথা।' [The Great Reversal, William Hinton] আনন্দের কথা, ইঁদুর ধরা না পড়লেও দুনিয়ার প্রকৃত মার্ক্সবাদীদের সামনে, চীনের সচেতন কমিউনিস্টদের কাছে কিন্তু বেড়ালটা ধরা পড়ে গিয়েছে। এই রকম বেড়াল মাঝে মাঝে বেরোয় এবং ধরা পড়ে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়াতে, অতি-সাম্রাজ্যবাদের ধারণা এনেছিলেন সংশোধনবাদী কাউটস্কি। বেড়াল ধরেছিলেন লেনিন। আর সিপিএম বাস্তব পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার জন্য যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের আবাহন করছে, আবার পুঁজির নিজস্ব দল কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করছে। এই তত্ত্বের সঙ্গে ঐ বেড়ালতত্ত্বের, দেং-এর, কাউটস্কির ধারণার বেশ মিল পাওয়া যায়।

লেনিনীয় শিক্ষার আলোকে সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব সমূহ ও পুঁজিবাদ সংস্কারবাদীদের স্বরূপ

আসলে কোটার আগের ও পরের সব চান্সই পুঁজিপতিদের চান্স, শ্রমিক শ্রেণীর নয়। লেনিনের একটা মহান শিক্ষা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ "লগ্নি পুঁজি ও ট্রাস্টগুলি বিশ্ব অর্থনীতিতে পার্থক্য কমায় না, বরং বাড়িয়ে দেয়।" [Imperialism : The Highest Stage of Capitalism]

রাষ্ট্রগুলি ভাগ হয়ে গিয়েছে ধনী ও গরীব রাষ্ট্রে। জনতা ভাগ হয়ে গিয়েছে ধনী ও গরীবে—পুঁজিপতি ও সর্বহারায়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্বন্ধ, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পর্বে লেনিনের কথাতেই বোঝা যাবে ঃ ... they form part of the sum total of divide the world relation, become links in the chain of operations of world's finance capital. (ঐ)

কোটা থাকা না-থাকা এবং হাজার একটা ধারা ও উপধারা যা WTO-তে বর্ণিত হয়েছে—তা ঐ সম্বন্ধ—ঐ chain of operations-এরই বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ। পুঁজিবাদের অনিরসনীয় বাজার সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও লগ্নীপুঁজির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের—যার উদ্দেশ্য বাজার দখল করা — এবং দেশে দেশে শ্রম-পুঁজির সংঘর্ষের গতিধারাতেই কোটা ব্যবস্থা এসেছিল এবং কোটা ব্যবস্থা অন্তর্হিত হয়েছে। এখানে শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণ-এর প্রশ্ন অবান্তর।

এমন এক পরিবেশে, লগ্নীপুঁজির বিশ্বজোড়া মৃগয়া ক্ষেত্রে, সিপিআই, সিপিএম এর মত তথাকথিত মার্কসবাদী দলগুলি ও তাদের সরকার লগ্নীপুঁজি টেনে আনতে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কি উদ্দেশ্য? না তাঁরা শিল্পের বন্যা বইয়ে দেবেন। তাঁরা লাখ লাখ বেকারকে কাজ দেবেন। এর মধ্যেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটাতে এবং তারই প্রয়োজনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 'গঠনমূলক' ভূমিকা পালন করার কথা তাঁরা বলছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো, এবং দারিদ্রের হার ও সংখ্যা কমানোর সাফল্যের দাবি তুলছেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের মধ্যে ফয়দা তোলার এই ধারণার মধ্যে কাউটস্কির ভূত তাড়া করে ফিরছে। বহুকাল আগেই লেনিন সংস্কারবাদী কাউটস্কির স্বরূপ উদঘাটন করে বলেছিলেন ঃ ''..... however, we are discussing the 'purely economic' conditions of the epoch of finance capital as a historically concrete epoch which appeared at the begining of twentieth century, then the best reply that one can make to the lifeless abstractions of ultra imperialism (which serve exclusively a most reactionary aim ; that diverting attention from the depth of existing antagonism) is to contrast them with the concrete economic realities of presentday world economy. Kautausky's is utterly meaningless talk about ultra-imperialism encourages, among other things that profoundly mistaken idea which only brings grist to will of the apologist of imperialism, viz, that the rule of finance capital lessen the unevenness and contradictions inherent in world economy, whereas in reality it increases them.'' [Imperialism : The Highest Stage of Capitalism : Lenin]

বে-আব্রু হয়ে যাওয়ার পর এখন চীনা ধুরন্ধর রাজনীতিক নেতারা ভিন্ন কথাও বলতে বাধ্য হচ্ছেন। চীনা অর্থনীতির আমলা ও বাণিজ্য সচিব উই বলেছেন, অর্থনৈতিক অসাম্যই উন্নয়ন বৃদ্ধির ফল। অনুরূপভাবে বুদ্ধবাবুদের রাজনীতিতে পুঁজিবাদের প্রতি দাসত্ব দেখে, তাদের সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে একচেটিয়া কর্পোরেট স্বার্থে পরিচালিত দৈনিক আনন্দবাজার উল্লসিত হয়ে বলেছে ঃ 'শ্রীবৃদ্ধির উপায় অসাম্য!' (আনন্দবাজার সম্পাদকীয়, ৭ মার্চ ২০০৫)

ভারত সরকারের প্রতিনিধি এবার জি-৭ ভুক্ত ধনী দেশের বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েছে। এই আমন্ত্রণ বৃহৎ শক্তিধর অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বীকৃতি মিলেছে। দুনিয়াকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে লুঠ করবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হিস্যা সে বুঝে নেবে তো বটেই। লুঠতরাজের পরিকল্পনার সে হেভিওয়েট অংশীদার।

'অ্যাসোচ্যাম' এর স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল ঃ 'আমরা বাস্তবে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে চাই যেখানে ভারত শত শত টাটা-বিড়লার জন্ম দেবে।' [GATT unmasked]

এই শত শত টাটা বিড়লাদের জন্ম দেওয়ার প্রয়োজনের স্বীকৃতি টেক্সটাইল ক্ষেত্রে নগ্নভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সরকারের ভূমিকা কি হতে যাচ্ছে— তা অল্পকথায় গ্যাট চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তি কালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বাজেট বক্তৃতায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ঃ Government and the Industry will work as active partners to usher in 2nd industrial revolution.

সুতরাং সেই দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের ঢেউ টেক্সটাইল ক্ষেত্রে আছড়ে পড়ছে—নতুন নতুন টাটা বিড়লা জন্ম দেওয়ার জন্য। সেই লক্ষ্যেই সরকারী নীতিও ঘোষিত হচ্ছে। এই বিপ্লবের যূপকাষ্ঠে শ্রমিকরা বলি হচ্ছে, আরও অগণিত শ্রমিক বলি হবে। আর এই 'বিপ্লবের' পথকে নিষ্কণ্টক করতেই সিপিএমের বিপ্লবী (!) লাইন!

সুতরাং টেক্সটাইল ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ও তীব্র আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ তীব্র হবে। এগুলিকে সুসংগঠিত পরিকল্পিত দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণী সংগ্রামে রূপ দেওয়ার জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারী নীতির বিরুদ্ধে যেমন লড়তে হবে—তেমনই গুরুত্ব দিয়ে বস্ত্র-পোষাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সিপিএম সিপিআই-এর মত মেকী মার্ক্সবাদীদের প্রভাবকেও তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে খতম করতে হবে।

এরই সঙ্গে দেশে দেশে টেক্সটাইল ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগ্রামগুলির যে ঢেউ উঠবে—সেগুলির সঙ্গে সামগ্রিক শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে সংযোজিত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে। আর এই সংগ্রামে সঠিক মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাও একান্ত জরুরী ঐতিহাসিক কর্তব্য। (সমাপ্ত)

রাস্তা দখল করে সিপিএমের ক্লাব, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

সিউড়ি থানার ছোট আলুন্দা গ্রামের মাহারা পাড়ায় সিপিআই (এম) দলভুক্ত কিছু যুবক পাড়ার যাতায়াতের মূল রাস্তা বন্ধ করে অবৈধভাবে একটি ক্লাব ঘর তৈরি করে। এতে চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ পাড়ারই এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢোকার মূল দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্লাবঘরটিকে সিপিএম সাক্ষরতা কেন্দ্র বলে চালাবার চেষ্টা করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সিপিএম মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে সাধারণ মানুষকে। গুরুতরভাবে জখম হন এক গৃহবধূ। এস ইউ সি আই সিউড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় যুক্ত দোষীদের গ্রেপ্তার ও অবৈধ চালা ঘরটি ভেঙে ফেলার দাবি জানিয়ে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে গত ২ সেপ্টেম্বর সিউড়ি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। গ্রামে গ্রামে সিপিএম'র সন্ত্রাস ও পুলিশ-প্রশাসনের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মানস সিংহ। পরে সিউড়ি থানায় আই-সি'র নিকট একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিনি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেন।

আর্সেনিক দূষণের প্রতিবাদে হরিহরপাড়ায় গণবিক্ষোভ

গত ২৪ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের চোঁয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাঠপাড়া ও মামুদপুর গ্রামের আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত মানুষরা প্রতিকারের আশায় বহরমপুর শহরে, জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে এসেছিলেন তাঁদের ক্ষোভ জানাতে। মামুদপুর গ্রামে এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ১৭ জন। গত ২৪ জুন ঐ গ্রামের কয়েকশ' লোক মিছিল করে বিডিও অফিসে গিয়ে ওই বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও কোন প্রতিকার হয়নি। ৩০ জুলাই হরিহরপাড়া বাজার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ও দূষণ প্রতিরোধ কমিটির ব্যবস্থাপনায় কলকাতার ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পরিচালনায় আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তার সমীক্ষা রিপোর্ট বিপজ্জনক। তাই এলাকার মানুষ জোট বেঁধে গড়ে তুলেছেন "আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি।" ডেপুটেশন দেওয়ার সময় সভাধিপতি জানান তাদের বিশেষ কিছু করার নেই। জেলাশাসক আগাম দিন ও সময় দেওয়া সত্ত্বেও দেখা করেন নি। প্রশাসনিক অবহেলার প্রতিবাদে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘট

একের পাতার পর

কাজগুলো সেরে ফেললে সংগঠিত ক্ষেত্রে মোটের উপর ইচ্ছামত লোক নেওয়া এবং ছাঁটাই করার পথও (হায়ার অ্যান্ড ফায়ার) প্রশস্ত হবে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ঐ)।

শ্রমআইনের প্রস্তাবিত সংশোধন বাতিলের দাবি ছাড়াও বেসরকারীকরণ-বিলগ্নীকরণ-ব্যাঙ্ক মার্জার বন্ধ করা ; রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবন, কেন্দ্রের ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, বৃহৎ শিল্প-মালিকদের কাছে পাওনা অনাদায়ী কর ও ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় করা ; বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও বিদ্যুৎ পর্ষদ বেসরকারীকরণের ধারাগুলি বাতিল করা ; কর্মসংস্থান বিলের সংশোধন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রামীণ ও শহুরে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা ; অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করা ; নয়া পেনশন স্কিম ও পেনসন বিল বাতিল করা ; ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষিত করা প্রভৃতি দাবিতে এই ধর্মঘট অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এন পি এম ও তার ঘোষণাপত্রে যথার্থই বলেছে — দেশের শ্রমজীবী ও শোষিত মানুষ এই সর্বনাশা বিপর্যয়ের নীরব দর্শক হতে পারে না।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে তীব্র বাজার সংকটের সামনে পড়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিজদেশে এবং অন্যদেশে শ্রমিকশ্রেণীর উপর ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনে। সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল, মালিকরা সেগুলি হরণ করার মাত্রা বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। সেই অধিকার হরণেরই দলিল উদার অর্থনীতি, যা নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর হাত ধরে এসেছিল। এই উদার অর্থনীতি মালিকদের প্রতি উদার, কিন্তু শ্রমিকদের প্রতি নির্মম, নিষ্ঠুর। পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি তীব্র বাজার সংকটের পর্যায়ে পুঁজিপতিরা সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকদেরকে শুধু ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে তাই নয়, কাজের সময় বাড়ানো এবং মজুরি কমানোর নীতি নিয়ে চলছে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। মালিকী আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যাতে লড়াই করতে না পারে সেজন্য সুপ্রিম কোর্ট-হাইকোর্টকে দিয়ে ধর্মঘটের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে।

এন এম পি ও'র স্পনসরিং কমিটির ঘোষণাপত্রে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে — বিজেপি'র এনডিএ সরকার ৬ বছর ক্ষমতায় থাকলেও জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যর্থতার কারণে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ইউপিএ সরকারের ১৬ মাসের শাসন দেশের শ্রমজীবী মানুষকে খুবই হতাশ করেছে। পাঁচ বার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানো, ব্যাঙ্কে-পোস্ট অফিসে সঞ্চয়ে, পি এফে সুদের হার কমানো, টেলিকম-বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও বীমাসহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির লগ্নিকে আরও উদার করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের রক্ষার প্রয়োজনে যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, তা শিথিল করে ৮৫টি দ্রব্যকে সংরক্ষণের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে এনডিএ সরকারের পথেই ইউপিএ সরকার চলছে। বস্তুত এনডিএ ও ইউপিএ দুটি জোটই বুর্জোয়াস্বার্থরক্ষাকারী দলগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছে, এদের মধ্যে মৌলিক শ্রেণীচরিত্রগত কোনও পার্থক্য নেই। বুর্জোয়াশ্রেণীই জনগণের বিক্ষোভকে বিপথচালিত করার জন্য এই দুই জোটকে পাল্টাপাল্টি করে সরকারে বসাচ্ছে।

এই অসহনীয় পরিস্থিতিতেই ২৯শে'র ধর্মঘটের আহ্বান এসেছে। একে সফল করার জন্য শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু এন এম পি ও'র শরিক সংগঠনগুলিকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে যথার্থ শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিচারিতা থাকলে চলবে না। কেন্দ্রের সরকারি নীতির বিরুদ্ধতা করে, রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে সেই একই নীতি নিয়ে চললে তা আন্দোলনের নৈতিক শক্তিকেই ধ্বংস করে দেবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যারা শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাবেন, তাঁদের সততা ও আন্তরিকতা নিয়েই সংশয় থাকবে।

২৯শে'র ধর্মঘটের আর একটি দুর্বলতার দিক হল, দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণী ও সরকারের যে ভয়াবহ আক্রমণের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট ডাকা হল, সেই আক্রমণকে যে কেবল একদিনের একটি ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না, এটা নেতৃত্ব জানা সত্ত্বেও, ধর্মঘটের আগেও কোনও আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়নি, পরেও কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়নি। ফলে সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তুতি থাকলে, একদিনের একটা সর্বভারতীয় ধর্মঘট সারা দেশের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আলোড়ন তুলে দিতে পারে, দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের সোপান রূপে কাজ করতে পারে, তার অভাব থেকে গেল।

এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই নয়া দিল্লির জাতীয় কনভেনশনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সহসভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, আমাদের বুঝতে হবে উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ-বিশ্বায়নের এই নীতির জন্যই শোষিত মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। আর এই নীতি হল আমাদের দেশে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীরই নীতি। এই নীতি কারুর ইচ্ছা বা ভুলের উপর গড়ে ওঠেনি। এই নীতি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে গভীর ভাবনা-চিন্তার ফসল। স্বভাবতই এই নীতি কেবলমাত্র একদিনের ধর্মঘটে পরিবর্তন করা যাবে না। এই নীতির পরিবর্তনের জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আর এই দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে না, যদি কলকারখানা এবং সমস্ত কাজের জায়গায় আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে না তোলা যায়। দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যা আমরা গড়ে তুলতে চাইছি তার শুরু হিসাবেই আগামী ২৯ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটকে বিবেচনা করতে হবে।

কলকাতায় যৌথ কনভেনশন

২৯ সেপ্টেম্বর সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে ৭ সেপ্টেম্বর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশাল শ্রমিক-কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে কমরেড হাসি হোড়, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে কমরেড দীপক দেব সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন। সভার শুরুতে সিটুর রাজ্য সম্পাদক কমরেড কালী ঘোষ মূল প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবের সমর্থনে অন্যান্যদের সঙ্গে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত সরকার জনমুখী নীতি গ্রহণ করবে এমন ধারণা বা বিশ্বাস আমাদের কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। তিনি বলেন, গ্যাট যেভাবে সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তা সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণে। কমরেড সাহা বলেন, কে কত বিদেশি পুঁজি ধরে আনতে পারে, তার জন্য ছুটে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা যায় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্ররা জানেন, বিশ্বায়িত পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধেই তাদের লড়তে হবে। বিদেশি পুঁজি এলে আহ্লাদিত হওয়ার কারণ নেই। দেশীয় পুঁজির সাথে বিদেশি পুঁজির জোটবন্ধনে যে তীব্র শোষণ চলবে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে 'উন্নয়নের' পেছনে ছুটেও লাভ নেই। এ উন্নয়ন সাধারণ মানুষের উন্নয়ন নয়। এ এক সর্বনাশা উন্নয়ন। সবশেষে কারখানা লেভেলে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলনের কমিটি গড়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলার বালি আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্গত সেলের বিশিষ্ট কর্মী কমরেড নাজিমুদ্দিন সেখ গত ৩০ আগস্ট বিকেলে করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে বহরমপুর সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।

আটের দশকের শেষ দিকে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে আর এস পি পরিত্যাগ করে এস ইউ সি আই দলের সাথে যুক্ত হন। নিঃশঙ্কচিত্তে অবিচলভাবে দলের সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তুলতে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা কখনই ভুলবার নয়। পাশের গ্রাম টুঙ্গিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আলো পৌঁছে দিয়ে দলের বিস্তৃতিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাল্যকালেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া এই দরিদ্র সন্তান সবসময়ই আদর্শকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

গত ৩১ আগস্ট বালিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গরিব মানুষের আপনজন এই মানুষটিকে শেষ বিদায় জানাতে পাট কাটার মরশুমেও ব্যাপক মানুষের জমায়েত হয়েছিল।

কমরেড নাজিমুদ্দিন সেখ লাল সেলাম

তেল থেকে সরকার ট্যাক্স ও কোম্পানিগুলো মুনাফা লুটছে

১৫.৬.২০০৪	পেট্রল - ৩৮·৬৯ টাকা (২ টাকা বৃদ্ধি)	ডিজেল - ২৫·০৩ টাকা (১·০৫ টাকা বৃদ্ধি)
১.৮.২০০৪	পেট্রল - ৩৯·৮৩ টাকা	ডিজেল - ২৬·৫১ টাকা
	(এই সময় গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০ টাকা বাড়ানো হয়)	
৪.১১.২০০৪	পেট্রল - ৪২·১০ টাকা	ডিজেল - ২৮·৭২ টাকা
২১.৬.২০০৫	পেট্রল - ৪৩·৭৯ টাকা	ডিজেল - ৩০·৮০ টাকা
৭.৯.২০০৫	পেট্রল - ৪৬·৯০ টাকা	ডিজেল - ৩২·৮৭ টাকা

২০০৪ সালের নভেম্বরে একবার পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ১.২১ টাকা কমে হয়েছিল ৪০·৮৯ টাকা।

সরকারের দাম বাড়ানোর যুক্তি ধোপে টেকে না

দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের যুক্তি হল বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে। সুতরাং তেল কোম্পানিগুলোকে বাঁচাতে দামবৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে ভারতের তেল উৎপাদক কোম্পানিগুলি ৫০ শতাংশ হারে লাভ করছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। ২০০৩ সালে ও এন জি সি'র মুনাফার পরিমাণ ছিল ৪,৯৬০ কোটি টাকা। ২০০৪ সালে সেটা বেড়ে হয় ৭,৪৭৪ কোটি টাকা। (দি স্টেটসম্যান ১৩.১১.'০৪) বেসরকারি কোম্পানি রিলায়েন্সের লাভ ২০০৪ সালে ৭,৫৭২ কোটি টাকা। (গণশক্তি, ৬.৯.০৫)

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও আরোপিত ট্যাক্স তুলে নিলে দাম অনেক কমে যায়

২০০২ সাল থেকে সরকার তৈলক্ষেত্রে ট্যাক্স বাড়াচ্ছে প্রতি বছর ২০ শতাংশ হারে। (দি স্টেটসম্যান ২৬.৬.'০৫) পেট্রোপণ্যে শুধু অন্তঃশুল্ক খাতে কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর আয় করেছে ৮২,০০০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারগুলির মিলিত আয় ৩৮,০০০ কোটি টাকা। (সংবাদ প্রতিদিন, ১৪.৮.'০৫)

তেলের দাম যখন ব্যারেল প্রতি ৬০ ডলার সেই সময় ট্যাক্স না চাপালে এক লিটার পেট্রল-ডিজেলের দাম ১৯ টাকার বেশি হত না। এই হিসাবে ব্যারেল প্রতি বর্তমান দাম ৬৮ ডলার ধরলে এক লিটার পেট্রল-ডিজেলের দাম হয় ২১·৫৩ টাকা। যেটা বর্তমানে কলকাতায় নেওয়া হচ্ছে পেট্রলে ৪৬·৯০ টাকা, ডিজেলে ৩২·৮৭ টাকা।

আরোপিত শুল্ক ও সেসের পরিমাণ

(২০০৪ সালের ১৬ নভেম্বরের দামের ভিত্তিতে)

পেট্রল — প্রতি লিটারে

আমদানি শুল্ক	২·১২ টাকা
আভ্যন্তরীণ শুল্ক	১২·০৭ টাকা
রাজ্যের বিক্রয় কর (২৫%)	৬·০৯ টাকা
কেন্দ্রের সেস ৩ টাকা + রাজ্যের সেস ১ টাকা	= ৪·০০ টাকা
মোট ট্যাক্স	= ২৪·২৮ টাকা

এক লিটার পেট্রলের দাম যখন কলকাতায় ৪০·৮৯ টাকা, তখন ট্যাক্স বাবদ ২৪·২৮ টাকা বাদ দিলে ১৬·৬১ টাকায় এক লিটার পেট্রল দেওয়া যায়।

ডিজেল — প্রতি লিটারে

আমদানি শুল্ক	২·২৯ টাকা
আভ্যন্তরীণ শুল্ক	৩·১৫ টাকা
রাজ্যের বিক্রয় কর (১৭%)	২·৭৭ টাকা
কেন্দ্রের সেস ৩ টাকা + রাজ্যের সেস ১ টাকা	= ৪·০০ টাকা
মোট ট্যাক্স	= ১২·২১ টাকা

এক লিটার ডিজেলের দাম যখন কলকাতায় ২৮·৭২ টাকা, তখন ট্যাক্স বাবদ ১২·২১ টাকা বাদ দিলে ১৬·৫১ টাকায় এক লিটার ডিজেল দেওয়া যায়।

(সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান ৭.৯.'০৫)

পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড় দিয়ে পেট্রোপণ্যের মধ্য দিয়ে জনগণের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপানোতে ইউপিএ, এনডিএতে কোথায় পার্থক্য? জনগণের দায়িত্ব শুধু কি ট্যাক্স বয়ে যাওয়া?

(সমস্ত হিসাব কলকাতার দামের ভিত্তিতে)

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

সালিম-গোষ্ঠীর হাতে হাজার হাজার বিঘা কৃষি জমি তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে

হাওড়ার ৭টি মৌজায় বন্‌ধ পালিত

বামফ্রন্ট সরকার নগরায়নের নামে হাজার হাজার বিঘা কৃষিজমি সালিম-গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। হাওড়াতেও উপনগরী গড়ে তোলার অজুহাতে সরকার কোনা-বালটিকুরি - খালিয়া - পাকুড়িয়া-তেঁতুলকুলি-বাঁকুড়া-সলপ প্রভৃতি ৭টি মৌজার ৩৯২ একর জমি সালিম গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ফলে কয়েক হাজার পরিবার জমি থেকে উচ্ছেদ হবে এবং কৃষকেরাও তাদের জমি হারাবে। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের এই জনবিরোধী, বহুজাতিক সংস্থা ও প্রোমোটার তোষণ নীতির প্রতিবাদে এবং কৃষিজমি বাঁচানোর দাবিতে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ওই ৭টি মৌজায় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। বন্‌ধের সমর্থনে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাপক প্রচার চলে। কৃষিজমি ও বসতবাড়ি হারানোর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষের সমর্থনে এই বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। বাঁকড়া, কোনা, বালিটিকুরির মতো শহর লাগোয়া এলাকা থেকে শুরু করে সলপ, পাকুড়িয়া, খালিয়া প্রভৃতি গ্রামীণ এলাকা সর্বত্রই ছিল বন্‌ধের ব্যাপক প্রভাব। বাঁকড়া, সলপ, কোনার সদাব্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিও কার্যত সুনসান। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ সরকারের এই তুঘলকি কাণ্ডের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

এস ইউ সি আই-এর হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী এই বন্‌ধ সফল করার জন্য এলাকাবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'জমি কেড়ে নেওয়ার এই সরকারি চক্রান্তকে রুখতে হলে সংগঠিত গণআন্দোলনের প্রয়োজন।' আর তার প্রস্তুতিতে অবিলম্বে জমি বাঁচাও কমিটি গড়ে তোলার জন্য দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিড়ি শ্রমিকদের করণদীঘি বিডিও অফিস ঘেরাও

কংগ্রেস তুমি ন্যূনতম মজুরি চালু কর, নইলে গদি থেকে সরে পড় স্লোগানে একদিন যে সিপিএম নেতারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করতেন, আজ তাদেরই প্রশাসন ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করছে না — করণদীঘি বিডিও অফিসের সামনে ১৬ আগস্ট শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশে একথা বললেন বিড়ি ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি কমরেড আবদুস সঈদ। ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী বিড়ি শ্রমিকদের ৭১·৯৫ টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু সিপিএম সরকার তা কার্যকর করতে মালিকদের উপর কোন চাপই দিচ্ছে না। চুক্তি অনুযায়ী ১ আগস্ট থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিড়ি শ্রমিকদের বর্ধিত নতুন মজুরি ৪১·০০ টাকা পাওয়ার কথা। ১ মাস পার হয়ে গেলেও মালিকপক্ষ তা কার্যকর করছে না। এই চুক্তি কার্যকরী করা, মেডিকেল ইউনিটকে বেসরকারীকরণ না করা, সকল শ্রমিকদের পি এফ, লগবুক প্রকাশ সহ ৯ দফা দাবিতে এদিন বিডিও অফিস অবরোধ করেছিল করণদীঘি বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। আন্দোলনের চাপে বিডিও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্ধিত কৃষি বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার অথবা ভর্তুকির দাবিতে জেলায় জেলায় অবরোধের ডাক

বিদ্যুৎ মাশুল বিশেষতঃ কৃষি বিদ্যুৎ মাশুল ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০ লক্ষ কৃষি পরিবার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। গত ১০ বছরে কৃষি বিদ্যুতের মাশুল ১৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ৫ সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, যদি এই মাশুল না কমানো হয় তবে বোরো চাষের সময় পশ্চিমবঙ্গে আত্মহত্যার মিছিল শুরু হবে। সেই কারণে রাজ্যের ১ লক্ষ ১০ হাজার কৃষি গ্রাহকদের মধ্যে ৭৩৯৮১ জন গ্রাহক বর্ধিত বিল বয়কট করেছেন জুলাই মাস থেকে। রাজ্য সরকার মিথ্যা প্রচার করছে যে, কৃষকরা মিটার নিলেই কমদামে বিদ্যুৎ পেতে পারে। প্রকৃত ঘটনা হল। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে মিটারের ব্যবস্থাই নেই। তিনি রাজ্য সরকারকে হয় বিদ্যুৎ আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল বাতিল অথবা অন্যান্য রাজ্যের মতো ভর্তুকি দিয়ে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবার জন্য আবেদন জানান।

শ্রী বিশ্বাস রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি এবং বামফ্রন্টের ছোট শরিকদের এই আন্দোলনের যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে না এলে এক বছর কৃষকরা বিল দেবে না। এবং ২২ সেপ্টেম্বর প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের দপ্তরে অবরোধ করা হবে। পুলিশী অত্যাচারের আশঙ্কা করে তিনি বলেন, বয়কটকারী এবং অবরোধকারীদের উপর পুলিশ অত্যাচার করলে স্থানীয় বন্‌ধ ডাকা হবে।

সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলী বলেন, প্রকৃত পক্ষে বিশ্বায়নের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে, প্রোমোটারদের জমি পাইয়ে দেওয়া এবং বহুজাতিক সংস্থাকে কম দামে বিদ্যুৎ দেবার জন্য এসব করা হচ্ছে।

• কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার • সস্তা দরে সার-বীজ-তেল সরবরাহ
• খেতমজুরের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে • কৃষক উচ্ছেদ করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জমি উপঢৌকন দেওয়ার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত প্রতিরোধে

২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায়

কৃষক ও খেতমজুরদের রাজ্য কনভেনশন

স্থান ঃ ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউট হল, কলকাতা

ডেঙ্গু ঃ কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ

মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং মেয়রকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল কলকাতা পুরসভায় পৌঁছায়। ভি আই পি গেটের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় বিভিন্ন বক্তা পুরসভা এবং রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের গাফিলতির দিকগুলি তুলে ধরেন। স্মারকলিপিতে (১) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া নিবারণ, (২) উপদ্রুত এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, (৩) পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে প্রয়োজনমত ঢেলে সাজানো এবং (৪) প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসহ চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রভৃতি ছয় দফা দাবি জানান হয়েছে। মেয়র ১৪ সেপ্টেম্বর দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার কথা জানান। ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে পুরসভার সমস্ত বরো অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকার ও পুরসভার যেসব কর্তাদের কল্যাণে ডেঙ্গু মহামারীর রূপ নিল

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন পুরসভা এবং সিপিএম ফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্য সরকার ও বর্তমান পুরসভার ক্ষমাহীন অবহেলায় ডেঙ্গু কীভাবে মহামারীর রূপ নিল টেলিগ্রাফ পত্রিকা (৯-৯-০৫) তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে।

সূর্যকান্ত মিশ্র, স্বাস্থ্যমন্ত্রী — ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক সতর্কবার্তাকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি এটাকে সংবাদ মাধ্যমের বাড়াবাড়ি বলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন এবং বারবারই বলছিলেন, "পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।"

সুব্রত মুখার্জী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মেয়র — মশা সমস্যা সমাধানের বিষয়টাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। ৬৫টি অকেজো মশা মারা কামান মেরামত করা প্রয়োজন মনে করেননি এবং সিটিজেন্স পার্ক, স্টার থিয়েটারের মতো "বড় বড় ব্যাপারে" জনগণের টাকা ব্যয় করেছেন। তিনি সংক্রমণ প্রতিরোধ বিভাগে ৮০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছেন।

প্রদীপ ঘোষ, মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) — তিনি তাঁর দপ্তরের কোন কাজ না করেই চেয়ার দখল করেছিলেন। তাঁর সময়কালেই ১০ লক্ষ টাকার মশার লার্ভা ধ্বংসকারী রাসায়নিক কেন্দ্রীয় গুদামে পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে। সুব্রত মুখার্জীর আমলের শেষ দিকে এই বিষয়টি ধরা পড়ে।

প্রভাকর চ্যাটার্জী, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর — ডেঙ্গুর ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং যখন এই রোগ চরম আঘাত হানলো তখন তিনি অপ্রস্তুত। ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষার সরঞ্জাম আগেও ছিল না, এখনও তার চরম অভাব। তাঁর কাছে আসা ডেঙ্গু সংক্রান্ত রিপোর্টকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

অতনু মুখার্জী, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (স্বাস্থ্য) — সুব্রত মুখার্জী নিজে তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন। ম্যালেরিয়ার পরিসংখ্যান "কম করে দেখানোই" ছিল তাঁর স্পেশাল ডিউটি। বর্তমান মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য সেকথা স্বীকার করেছেন।

সুবোধ দে, বর্তমান মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) — সংক্রমণ প্রতিরোধ কর্মসূচিকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তার চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। "ডেঙ্গু পরীক্ষা করার সরঞ্জাম বা তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই আমাদের নেই" — প্রতি কথায় এই হ'ল তাঁর ধুয়ো।

দীপঙ্কর দাস, ডেঙ্গু নির্মূলীকরণের ভারপ্রাপ্ত, কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার — তিনি দু'সপ্তাহ আগে দায়িত্ব পেয়েছেন কিন্তু সব সময়ই দায়িত্ব এড়াতে তৎপর। তাঁর এক কথা — "আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। ডেঙ্গুর মহামারী কোথায়?"

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেয়র — "আমি এখনও মনে করি ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ করেনি। কয়েক হাজার মানুষের রক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে ৬০ লক্ষ লোকের এই শহরে মহামারীর সিদ্ধান্ত হয় কী করে?"

(সূত্র ঃ দি টেলিগ্রাফ, ৯-৯-০৫)

কত মানুষ মরলে পরে মেয়র বলবেন মহামারী?

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা রাজপথে

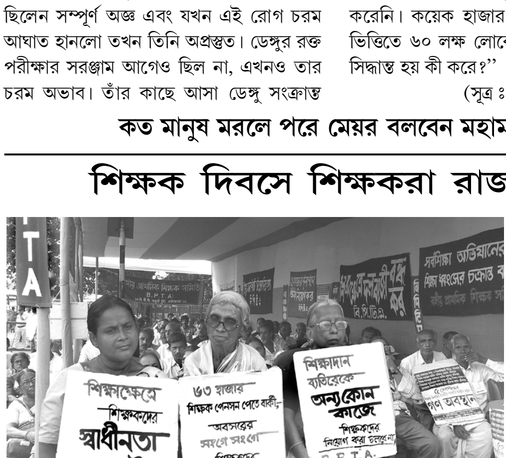

রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষকবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের যাবতীয় সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন করে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এসপ্ল্যানেডে সারাদিনব্যাপী অবস্থান আন্দোলনে সামিল হন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in